জাতীয়তাবাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংকলন ও সম্পাদনা

সুমন দত্ত

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

জাতীয়তাবাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৯

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক
www.amaderboi.com/projonmo
www.rokomari.com/publisher/8485
www.boibazar.com/projonmo-publication

মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Jatiyotabad by Rabindranath Tagore, Edited by Sumon Datta
Published by Projonmo Publication
Price : 150 Taka, 9 US$
ISBN : 978-984-94392-2-6

ভূমিকা

বহুদিন ধরেই জাপান সফরের কথা ভাবছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৫ সালে জাপান যাত্রা স্থির হলেও শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দেন। বাতিল করার পিছনে মূল কারণ ছিল অর্থ-সঙ্কট। এছাড়াও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী মতিগতিও কবির অপছন্দের ছিল। আরও একটা কারণ ছিল শিলাইদহ এস্টেটে প্রজাদের সংকটাপন্ন অবস্থা। কিন্তু তবুও ভক্তদের বারংবার অনুরোধে এবং পরের বছর আমেরিকার কীডিক এজেন্সি কবিকে ৪০ টি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সম্মানী ও আসা-যাওয়ার খরচ দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি আমন্ত্রন গ্রহণ করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেন আগে জাপান সফর পরে যুক্তরাষ্ট্র।

১৯১৬ সালের মে মাসে তোসামারু জাহাজে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গে ছিলেন অ্যান্ডরুজ, পিয়ারসন ও শান্তিনিকেতনের এক ছাত্র মুকুলচন্দ্র দে। জাপানে কবি ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করে বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা দান করেন। টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রন করা হলে কবি সেখানে 'The Message of India to Japan' শিরোনামের একটি গুরত্বপূর্ন ভাষন দেন। কিয়ো ইউনিভার্সিটিতে 'The Spirit of Japan' নামে আরো একটা গুরত্বপূর্ন বক্তব্য দেন। দুটো বক্তব্যই যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল জাপানে।

জাপান সফর শেষে ১৯১৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কবি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতন

বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। যুক্তরাষ্ট্রে কবি বেশিরভাগ বক্তৃতায় 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধ পাঠ করেন। জাপানের মতো পশ্চিমেও সমালোচনার মুখোমুখি হয়েও কবি নির্ভীকচিত্তে পশ্চিমাদের 'The Cult of Nationalism' শোনান বারংবার।

জাপান ও আমেরিকাবাসীদের বারংবার শোনাতে চাওয়া কবির সেখানে 'The Message of India to Japan', 'The Spirit of Japan', 'The Cult of Nationalism' শিরোনামের বক্তৃতাগুলোই পরবর্তীতে 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুমন দত্ত

সূচিপত্র

নেশন কী..... ৭

জাপানে জাতীয়তাবাদ..... ১৩

জাপানে জাতীয়তাবাদ ২.....২৭

পশ্চিমে জাতীয়তাবাদ.....৪৪

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ.....৭৩

নেশন কী

জাতীয়তাবাদ বইটিতে অসংখ্য জায়গায় 'নেশন' নামক শব্দটির দেখা মিলবে। নেশন ব্যাপারটি কী এটা বুঝার জন্য কবির আত্মশক্তি গ্রন্থের "নেশন কী" প্রবন্ধ পাঠ করা প্রয়োজন।

'নেশন' ব্যাপারটা কী, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি ভাবুক রেঁনা এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে দুই একটা শব্দার্থ করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায় এবং জাতি বলিতে ইংরেজিতে-যাহাকে race বলে তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি' শব্দ ইংরেজি 'রেস' শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব এবং 'নেশন'কে 'নেশন'ই বলিব। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।

'ন্যাশনাল কংগ্রেস' শব্দের তর্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহাসভা' ব্যবহার করিয়া থাকি—কিন্তু 'জাতীয়' বলিলে বাঙালি-জাতীয়, মারাঠি-জাতীয়, শিখ-জাতীয়, যে-কোনো জাতীয় বুঝাইতে পারে—ভারতবর্ষের সর্বজাতীয় বুঝায় না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই 'ন্যাশনাল' শব্দের অনুবাদ-চেষ্টায় 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাহারা স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে মহাজনসভা ও সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন—বাঙালি কোনোপ্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠি প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙালির যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়—সেই প্রভেদে বাঙালির আন্তরিক ন্যাশনালত্বের দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাংলায় একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে চলিবে না। 'সার্বজনিক' শব্দকে বিশেষ্য আকারে নেশন শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফরাসি সর্বজন' শব্দ 'ফরাসি নেশন' শব্দের পরিবর্তে সংগত শুনিতে হয় না।

'মহাজন' শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহাজাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহৎ' শব্দ মহত্ত্বসূচক বিশেষণরূপে অনেকস্থলেই 'নেশন' শব্দের পূর্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট নেশন' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'ক্ষুদ্র মহাজাতি' বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরেজি রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরেজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেঁনা বলেন, প্রাচীনকালে 'নেশন' ছিল না। ইজিপ্ট চীন প্রাচীন কালডিয়া 'নেশন' জানিত না। আসিরীয়, পারসিক ও আলেক্‌জাণ্ডারের সাম্রাজ্যকে কোনো নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।

রোম-সাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন বাঁধিতে না-বাঁধিতে বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল। এই সকল টুকরা বহু শতাব্দী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন কেন? সুইজারল্যান্ড তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন হইল? অস্ট্রিয়া কেন কেবল রাজ্য হইল, নেশন হইল না?

কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোনো বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যায়; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড পূর্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন হইতে ইতালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তর ছোটো ছোটো রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তো রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে নেশন টিকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারো অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে ন্যাশনাল অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই ন্যাশনাল অধিকারের ভিত্তি কী, কোন লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে?

অনেকে বলেন, জাতির অর্থাৎ race এর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব, জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাঁটি।

কিন্তু, জাতিমিশ্রণ হয় নাই ইউরোপে এমন দেশ নাই। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। কে টিউটন, কে কেল্ট, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষা সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। ভাষার ঐক্যে ন্যাশনাল ঐক্যবন্ধনের সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে এক করিবেই এমন কোনো জবরদস্তি নাই। ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ও ইংল্যান্ডের ভাষা এক, স্পেন ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহারা এক নেশন নহে। অপর পক্ষে সুইজারল্যান্ডে তিনটা-চারিটা ভাষা আছে, তবু সেখানে এক নেশন। ভাষা অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বড়ো; ভাষাবৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমস্ত সুইজারল্যান্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও ঠিক নয়। প্রুসিয়া আজ জার্মান বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্লাভোনিক বলিত, ওয়েল্‌স্ ইংরেজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবি ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

'নেশন' ধর্মমতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, ইহুদি অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরেজ, ফরাসি বা জার্মান হইবার কোনো বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ় বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেঁনার মতে সে বন্ধন নেশন বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েত-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু ন্যাশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান

আছে—তাহার যেমন দেহ আছে তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজনটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীস্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায় নেশন গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মনথনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জাতি ভাষা বৈষয়িক স্বার্থ ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন-নামক মানস পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী?

নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত-ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমত নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প—ইহাই জনসম্প্রদায়-গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি আমাদের ভালোবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। আমরা যে বাড়ি নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব সে বাড়িকে আমরা ভালোবাসি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে,

'তোমরা যাহা ছিলে আমরা তাহাই, তোমরা যাহা আমরা তাহাই হইব'। এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের ন্যাশনাল গাথাস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ—একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা—এইগুলিই আসল জিনিস, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়; একত্রে মাসুলখানা-স্থাপন বা সীমান্ত নির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগ দুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেঁনা বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রযন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্মের আধিপত্য নির্বাসিত করিয়াছি, এখন বাকি কী রহিল? মানুষ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের প্রয়োজনসকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনিয়ন্ত্রিত অশিক্ষিত—তাহার হস্তে নেশনের ন্যাশনালিটির মতো প্রাচীন মহৎসম্পদ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন আছে—কিন্তু পৃথিবীতে এমন-কিছু আছে যাহার পরিবর্তন নাই? নেশনরা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয়তো এই নেশনদের পরিবর্তনকালে এক ইউরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার পক্ষে এই নেশনসকলের ভিন্নতাই ভালো, তাহাই আবশ্যক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে—এক আইন, এক প্রভু হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সংকট।

বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতাবিস্তারকার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক-একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে

একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারো একক চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেঁনা বলেন—মানুষ জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদীপর্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চারিত্র সৃজন করে তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা এই চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে ততক্ষণ তাহাকে সাচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

জাপানে জাতীয়তাবাদ

৩রা মে ১৯১৬ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার খিদিরপুর থেকে 'তোসামারু' নামের এক মালবাহী জাপানি জাহাজে জাপান সফরে যান। জাপানের টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কবি সেখানে 'The Message of India to Japan' শিরোনামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষন দেন। এই ভাষনের ঈষৎ সংক্ষিপ্তরূপই 'জাপানে জাতীয়তাবাদ' নামে 'ন্যাশনালিজম' (জাতীয়তাবাদ) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জাপানে জাতীয়তাবাদ ও পশ্চিমে জাতীয়তাবাদ অধ্যায়টি বঙ্গানুবাদ করেছেন অশোককুমার মুখোপাধ্যায়।

দাসত্বের নিকৃষ্ট রূপ হলো অবসাদের দাসত্ব, যা মানুষকে নিজের ওপর বিশ্বাস হারানোর শৃঙ্খলে বেঁধে চরম হতাশার মধ্যে ফেলে দেয়। আমাদের একথাই বলা হয়েছে– যার মধ্যে কিছু যুক্তি থাকতে পারে যে, এশিয়া অতীতের মধ্যে বসে করে। তার এই অতীত উৎকৃষ্ট সমাধি-মন্দিরের মতো যার মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে অমর করে রাখার জন্য সব রকমের জাঁকজমক সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এশিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সে কখনই প্রগতির পথে চলতে পারেনি, তার মুখ অনিবার্যভাবে পেছন দিকেই ফিরে থাকে। আমরা এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছি এবং একথা বিশ্বাস করেছি। আমি জানি ভারতে আমাদের শিক্ষিত মানুষদের একটা বড় অংশ আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনতে শুনতে ক্লান্ত বোধ করায় তারা আত্ম-প্রবঞ্চনার সকল শক্তি নিয়ে এই অভিযোগকে গর্বের বিষয়ে পরিণত করতে চাইছেন। কিন্তু আত্মশ্লাঘা শুধুই লজ্জা ঢাকতে চায়, এর নিজের আর কোনো বিশ্বাস নেই।

এই যখন অবস্থা এবং আমরা এশিয়াবাসীরা যখন এই বিশ্বাসে সম্মোহিত যে এই অবস্থার অন্যথা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন জাপান তার মোহভঙ্গ করে জেগে ওঠে। শতাব্দীপ্রাচীন নিষ্ক্রিয়তাকে পেছনে ফেলে দীর্ঘ পদক্ষেপ এগিয়ে চলে, বর্তমান যুগের মুখ্য সাফল্যকে ধরে ফেলে। এই ঘটনায় আমাদের যুগ যুগব্যাপী আচ্ছন্নতা ভেঙে যায় এবং আমরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি যে, বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থায় বসবাসকারী বিশেষ জাতির পক্ষে এমন অগ্রগতি স্বাভাবিক। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, এশিয়ায় বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল। দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং এখানেই বিশ্বের সব ধর্মের জন্ম হয়েছিল। সুতরাং এমন কথা বলা যায় না যে, এশিয়ার জমিতে ও জলবায়ুতে এমন কিছু আছে যার ফলে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা তৈরি হয় এবং মানুষের এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্যের অবক্ষয় ঘটে। কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাচ্যে সভ্যতার আলোকবর্তিকা আমরা ধরে রেখেছিলাম তখন পাশ্চাত্য অন্ধকারে ঘুমিয়ে

ছিল, সুতরাং একে কখনোই মানসিক আলস্যপরায়ণতা অথবা দৃষ্টির সংকীর্ণতা বলা যায় না।

তারপর প্রাচ্যের সকল দেশে রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো। সেই সঙ্গে কালের স্রোত থেমে গেল এবং এশিয়া নতুন কোনো খাদ্য গ্রহণ করা বন্ধ করে দিল। নিজের অতীত থেকে খাদ্য আহরণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে লাগল। এই থেমে যাওয়া মৃত্যুর নামান্তর। এই স্তব্ধতা মৃত্যুর সমান। তার মহান বক্তব্য চিরকালীন সত্যের বাণী প্রচার করে বংশপরম্পরায় মানুষের জীবনকে দূষণ থেকে বাঁচিয়েছিল ঠিক যেভাবে বায়ুসমুদ্র বংশপরম্পরায় মানুষের পৃথিবীকে চিরকাল দূষণ থেকে রক্ষা করে তার কলুষ পরিষ্কার করে। তার সেই বক্তব্য শেষ পর্যন্ত নিঃস্তব্ধতায় পরিণত হয়।

কিন্তু মানুষের জীবনে নিদ্রা আছে, কর্মহীন মুহূর্ত আছে, যখন সে তার গতি হারিয়ে ফেলে, কোনো খাদ্যগ্রহণ করে না, শুধু তার অতীতের সংগ্রহের ওপর ভরসা করে জীবন কাটায়। তখন সে অসহায় হয়ে পড়ে। তার মাংসপেশি নিষ্ক্রিয় হয়ে আরাম করে, এবং তার নিদ্রাচ্ছন্ন ভাবের কারণে সে সহজেই অন্যের উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়। জীবনের ছন্দে জীবনীশক্তি নবীকরণের জন্য মাঝে মাঝে থামতে হয়। কর্মময় জীবন সদাসর্বদা নিজের শক্তি ক্ষয় করছে, তার সমস্ত জ্বালানি খরচ করছে। এই বেহিসেবি খরচ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলতে পারে না। এরপর সবসময় একটি নিষ্ক্রিয়তার স্তর আসে যখন সকল শক্তিক্ষয় থেমে যায় এবং সকল দুঃসাহসিক কাজ পরিত্যক্ত হয় যাতে বিশ্রাম করে ও ধীরগতিতে শক্তি অর্জন করে পুনরায় যাত্রারম্ভ করা যায়।

মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো মাত্রাধিক ব্যয় না করা। মন অভ্যাস গড়ে তুলতে ভালোবাসে যা জীবনের বাঁধা ছকে ফিরে আসে, এবং এইভাবে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নতুন করে চিন্তা করার ঝামেলা থেকে মনকে রক্ষা করে। একবার কোনো আদর্শ তৈরি হয়ে গেলে তা মনকে অলস করে তোলে। সম্পূর্ণ নতুন করে কোনো আদর্শভিত্তিক অভ্যাস অর্জন করতে মানুষের মন ভয় পায়। মন চায় নিজের সমস্ত বিষয়কে আড়াল করে অভ্যাসের বেড়াজালের মধ্যে পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো নিজের সমস্ত গুণাবলিকে পুর্ণ বিকাশ হতে না দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা। এটা হলো কৃপণতা। বিকাশশীল এবং পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করা প্রাণবন্ত মতাদর্শের উচিত নয়। নিরাপত্তার

ঘেরাটোপে বাস করে মতাদর্শের যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নয়; দুঃসাহসিকতার রাজপথে পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেই মতাদর্শের স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব।

কোনো এক প্রভাবে সারা জগৎ আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেল জাপান রাতের পুরনো অভ্যাসগুলো প্রাচীর ভেঙে সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছে। এই পরিবর্তনটি এত অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ের মধ্যে ঘটেছিল যে মনে হয়েছিল জাপান যেন নতুন কোনো কাঠামো গড়ে তোলার বদলে তার বেশভূষা পাল্টে নিয়েছে। বড় হয়ে ওঠার জন্য জাপান তার আত্মবিশ্বাসের শক্তি দেখিয়েছিল এবং একই সঙ্গে তার নতুন জীবনের প্রাণোচ্ছলতা এবং অসীম সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছিল। ভয় হয়েছিল হয়তো বা এটি ছিল শুধু ইতিহাসের কোনো খামখেয়াল, মহাকালের সঙ্গে কোনো শিশুর খেলা, সাবানের বুদবুদের রঙ ও মিলের সুন্দর বিস্ফোরণ, যার কোনো সারবস্তু নেই এবং অন্তরে যা শুন্য। কিন্তু জাপান নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করল যে তার এই সহসা শক্তি প্রদর্শন কোন মুহর্তমাত্রের বিস্ময় ছিল না, মহাকাল ও স্রোতের আকস্মিক কোনো ব্যাপার ছিল না, যা দুর্জ্ঞেয় অন্ধকারের গভীর তলদেশ থেকে সহসা উঠে এসেছিল। এবং পরমুহূর্তেই বিস্মৃতির অতল সাগরে ভেসে গিয়েছিল।

সত্য কথাটা এই যে, জাপান একই সঙ্গে প্রাচীন ও নবীন। তার ছিল প্রাচ্যের প্রাচীন সংস্কৃতির নিজস্ব উত্তরাধিকার, যে সংস্কৃতি মানুষকে তার অন্তরাত্মার যথার্থ বৈভব ও শক্তিকে খুঁজে নিতে শেখায়, যে সংস্কৃতি ক্ষতি ও বিপদের মুখে আত্মনিয়ন্ত্রণ এনে দেয়, লাভ-ক্ষতি হিসাব না করে আত্মোৎসর্গ শেখায়, মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শেখায় এবং মানসিক জীব হিসেবে অসংখ্য সামাজিক কর্তব্যবন্ধন গ্রহণ করতে শেখায়। এককথায় আধুনিক জাপান জেগে উঠেছে অবিস্মরণীয় প্রাচ্য থেকে, ঠিক যেমন পদ্মফুল তার স্বাভাবিক লাবণ্যে প্রস্ফুটিত হয় সব সময় গভীর যে জায়গা থেকে তার উঠে আসা তার ওপর নিজের পূর্ণ অধিকার বজায় রেখেই।

প্রাচীন প্রাচ্যের শিশু জাপানও নির্ভিকভাবে নিজের জন্য আধুনিক যুগের সব সহজাত গুণ দাবি করেছে। অভ্যাসের এবং অলস মনের অপ্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের বদ্ধ অবস্থা ভেঙে সে তার সাহসী প্রাণসত্তা দেখিয়েছে। তার প্রাণসত্তা তার মিতব্যয়িতা এবং তার তালা-চাবির নিরাপত্তা খুঁজে বেড়িয়েছে।

এইভাবে সে সজীব কালের সংস্পর্শে এসেছে এবং তার আগ্রহ ও সহজাত কুশলতার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার দায়িত্বগুলো স্বীকার করেছে।

এই ব্যাপারটা এশিয়ার অন্যান্য দেশের মনে সাহস জুগিয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের মধ্যেও জীবন ও শক্তি আছে; শুধু কঠিন আবরণটি সরিয়ে ফেলতে হবে। আমরা দেখেছি মৃত ব্যক্তির কাছে আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হল মৃত্যুই এবং পরিপূর্ণভাবে জীবনের সব ঝুঁকি নেওয়ার নামই হল জীবন।

আমি বিশ্বাস করি না জাপান যা হয়ে উঠেছে তা সে পাশ্চাত্যের নকল করেই হতে পেরেছে। আমরা জীবনের অনুকরণ করতে পারি না, দীর্ঘকাল ধরে শক্তি উদ্দীপনা বজায় রাখতে পারি না; আবার শুধু অনুকরণ করার অর্থ দুর্বলতা। কারণ, এতে আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব সময় এটাই স্বাভাবিক। একথা সত্য যে, অন্য মানুষের চামড়া দিয়ে নিজেদের কঙ্কালকে সাজিয়ে তুললে চলনের প্রতিপদে চর্ম ও অস্থি-র মধ্যে চিরকালীন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

প্রকৃত সত্য হলো বিজ্ঞান মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি নয়, বিজ্ঞান হলো শুধুই জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ। বস্তুভিত্তিক বিশ্বের আইন আবিষ্কার করে মানুষের গভীরতর মানবিকতাকে জানা যায় না। অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান ধার করা যায়, কিন্তু মানসিক গঠন শেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের শিক্ষা লাভ প্রক্রিয়ায় অনুকরণ স্তরে আমরা একান্ত প্রয়োজনীয় ও একান্ত অপ্রয়োজনীয়ের মধ্যে এবং হস্তান্তরযোগ্য ও অ-হস্তান্তরযোগ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না, ঠিক যেমন আদিম মানুষ আপতিক ঘটনার বাহ্যিক দিকের ঐন্দ্রজালিক গুণে বিশ্বাস করার ফলে তার আসল কারণ বুঝতে পারত না। শাঁসের সঙ্গে খোসা একসঙ্গে গিলে ফেলতে না পারার কারণে মূল্যবান এবং ফলপ্রদ বস্তুকে ত্যাগ করার আশঙ্কা আমাদের মনে থেকেই যায়। যদিও আমাদের লোভের বশে সবসুদ্ধ খেয়ে ফেলার আপাত আনন্দ থাকে বটে কিন্তু জীবনীশক্তির কাজই হলো হজম করা, যা যেকোনো সজীব প্রাণীর একমাত্র প্রকৃত কাজ। যেখানেই জীবন আছে সেখানে সে নিজস্ব শারীরিক প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করবেই। সজীব প্রাণী কখনই নিজেই নিজের খাদ্য হয় না; সে তার খাদ্য শরীরের মধ্যে রূপান্তরিত করে। একমাত্র এভাবে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কখনই শুধু অনুকরণ করে নয় বা তার নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়।

জাপান পাশ্চাত্য থেকে তার খাদ্য আমদানি করেছে। কিন্তু তার প্রাণশক্তি আমদানি করেনি। জাপান সম্পূর্ণভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক আদবকায়দার সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে শুধু একটি ধার-করা যন্ত্রে পরিণত হতে দিতে পারে না। তার নিজস্ব আত্মা আছে যা তার সব প্রয়োজনের ওপরে গিয়ে নিজেকে উপস্থিত করবে। সে যে সে-রকম কিছু করার যোগ্য এবং মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়াটি যে বহমান তা প্রমাণ হয় তার সতেজ জাতীয় স্বাস্থ্য থেকে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি জাপান কোনও দিন শুধু স্বোপার্জিত বিদেশি জিনিসের জন্য তার নিজের আত্মার ওপর বিশ্বাস হারাবে না। কারণ, তার সে ধরনের গর্বটাই এক অপমানস্বরূপ যা শেষমেশ তাকে দারিদ্র্য ও দুর্বলতার পথে নিয়ে যাবে।

আধুনিক যুগের হাত থেকে সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রাচ্যের এই মহান জাতি কি করতে যাচ্ছে, তা দেখার জন্য সারা পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে। যদি তা শুধু পশ্চিমের পুনরুৎপাদন মাত্র হয়, তাহলে নিজের সম্বন্ধে যে মহতী আশা সে জাগিয়ে তুলেছে তা অপূর্ণ থেকে যাবে। কারণ, বিশ্বের সামনে পশ্চিমি সভ্যতা গভীর প্রশ্ন তুলে ধরেছে, কিন্তু সেগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে পারেনি। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে, জাগতিক লাভ ও মানুষের আত্মিক জীবনের মধ্যে, জাতিসমূহের সংগঠিত স্বার্থপরতা ও মানুষের উচ্চতর আদর্শের মধ্যে, বাণিজ্যের ও রাষ্ট্রের দানবিক সংগঠনগুলো থেকে অবিচ্ছেদ্য সমস্ত কুৎসিত জটিলতা ও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা সারল্য, সৌন্দর্য ও বিশ্রামের পরিপূর্ণতা ভীষণভাবে চায় এদের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। এই সব সংঘাতকে এমনভাবে মেলাতে হবে যা আগে স্বপ্নেও ভাবা হয়নি।

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সভ্যতার এই মহান ধারা কীভাবে অসংখ্য প্রণালিবাহিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করেছে। আমরা এও দেখেছি এই ধারা মনুষ্যত্বের জন্য তার সগর্ব প্রেম সমগ্র মানব জাতির কাছেই সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে উঠেছে, যা মানব ইতিহাসের প্রথম যুগের যাযাবর বর্বরতার আকস্মিক বিস্ফোরণের চেয়েও নিকৃষ্ট। আমরা দেখেছি স্বাধীনতার জন্য এর বড়াই সত্ত্বেও এ এমন এক ধরনের দাসত্ব সৃষ্টি করেছে যার শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব নয়, কারণ পূর্বেকার সমাজব্যবস্থায় সে শৃঙ্খল দেখা যায়নি, অথবা তা স্বাধীনতা বলে, এবং আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনতা রূপে, পরিচিত হয়। আমরা দেখেছি এর দানবিক নীচতার সম্মোহনী প্রভাবে

মানুষের জীবনের সকল বীরোচিত আদর্শ, যা তাকে মহান করে তুলেছে, সেগুলো ওপর মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

সুতরাং আধুনিক সভ্যতাকে তার সকল প্রবণতা, পদ্ধতি এবং কাঠামোসমেত খুব হাল্কাভাবে দেখা সম্ভব নয় এবং সেগুলো যে অবশ্যম্ভাবী তা স্বপ্নে ভাবাও সম্ভব নয়। প্রাচ্যের বিশেষ মানসিকতা, তার আত্মিক শক্তি, সারল্যের প্রতি অনুরাগ এবং সামাজিক কর্তব্যবন্ধনে সবকিছুকে স্বীকার করে নিয়েই ভাবতে হবে কীভাবে প্রগতির বৃহদাকার রথের চলার ফলে যে উচ্চগ্রামের অমিল বা বিবাদ-সৃষ্টিকারী কর্কশ আওয়াজ বের হয়, তা নিবারণের জন্য নতুন পন্থা বের করা যায়। মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথে জীবন ও মুক্তির স্বার্থে যে বিশাল আত্মত্যাগ করতে হয় তা কীভাবে কমানো যায় ভাবতে হবে। অনেক প্রজন্মব্যাপী মানুষ তার নিজস্ব বিশিষ্ট ধরনেই অনুভব করেছে, কাজ করেছে, আনন্দ উপভোগ করেছে এবং উপাসনা করেছে; পুরনো জামা কাপড়ের মতো সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। তা বয়ে চলেছে মানুষের রক্তে, অস্থিমজ্জায়, মাংসপেশির বুননে, মস্তিষ্কের কোষে; এবং তা পালটে দেবে সবকিছুকেই যার ওপর অজান্তে, এমনকি ইচ্ছার বিরুদ্ধে, হস্তক্ষেপ করা হলো।

একবার যদি সন্তোষজনকভাবে মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়, তাহলে নিজস্ব এক জীবনদর্শন পাওয়া যায় এবং তার ফলে নিজস্ব জীবনযাত্রার শৈলী বিবর্তিত হয়ে গড়ে ওঠে। বর্তমান অবস্থা বিচারের জন্য এসবকিছুকে ব্যবহার করতে হবে এবং সেখান থেকেই নতুন সৃষ্টি উঠে আসবে যা শুধু পুনরাবৃত্তি হবে না। এই নতুন সৃষ্টি সমগ্র জাতির আত্মাকে নিজের জন্য আবিষ্কার করবে এবং গর্বের সঙ্গে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে জগৎকে তা উপহার দিতে পারবে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র জাপানেই পশ্চিম থেকে আহরিত বিষয়বস্তু নিজের প্রতিভা ও প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করার স্বাধীনতা পাওয়া যায়। সুতরাং সে কারণে নিজের দায়িত্ব বেড়ে যায়, এইভাবেই সমগ্র মানব জাতির কাছে ইউরোপের তুলে-ধরা প্রশ্নগুলোর উত্তর এশিয়া দিতে পারবে। নিজের দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় যার সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন দিকে এশিয়া পরিবর্তন আনতে পারে, যান্ত্রিক জীবনে প্রাণসঞ্চার করতে পারে, প্রাণহীন সুবিধাবাদের জায়গায় মানুষের হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, ক্ষমতা ও সাফল্যের বদলে

সুসংগত ও জীবন্ত বুদ্ধি এবং সত্য ও সুন্দরের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায় সেই সব দিনের কথা যখন বার্মা থেকে জাপান পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব এশিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে এক দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, যা ছিল বিভিন্ন জাতির মধ্যে একমাত্র স্বাভাবিক যোগসূত্র। এক ধরনের প্রাণবন্ত সংযোগ ছিল। এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্র গড়ে উঠেছিল যার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে মানব জাতির গভীরতম প্রয়োজনগুলো সম্বন্ধে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। কেউ কারোর ভয়ে জীবনধারণ করত না; ভাব ও আদর্শের দেওয়া নেওয়া চলত; ভাষা ও সামাজিক প্রথার বৈচিত্র্য আমাদের পরস্পরকে হৃদয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসায় কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি; জাতিগত কোনো গর্ববোধ অথবা শারীরিক কিংবা মানসিক উচ্চমন্যতাজনিত দাম্ভিক সচেতনতা আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে পারেনি; আমাদের হৃদয়ের এই সূর্যালোকে বিকশিত আমাদের কলাশাস্ত্র এবং সাহিত্য নতুন পত্রপুষ্প তৈরি করেছিল; ভিন্ন দেশ, ভাষা ও ইতিহাস দুই জাতি মানবজাতির ঐক্য এবং ভালোবাসার গভীরতম বন্ধনের কথা স্বীকার করেছিল। আমরা একথাও স্মরণ করতে পারি যে, শান্তি ও সদিচ্ছার ঐসব দিনগুলো যখন-মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল, তখন স্বভাবতই আপনারা জাপানবাসীরা অমরতার প্রলেপ দিয়ে আপনাদের দেশের মানুষকে নতুন যুগে নতুন করে জন্ম নিতে সাহায্য করেছিলেন, যাতে পুরনো জীর্ণ কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে এসে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন, নতুন তরুণ দেহে বিশ্বের আশ্চর্যতম বিপ্লবের অভিঘাত থেকে অক্ষতভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন।

ইউরোপের মাটি থেকে উঠে-আসা যে রাষ্ট্রিক সভ্যতা কোনো বিশেষ ধরনের দ্রুত-বেড়ে ওঠা আগাছার মতো সারা জগৎকে প্লাবিত করছে তার ভিত্তি হলো ইউরোপের স্বাতন্ত্র্যাভিমান। এই সভ্যতা সবসময় বিদেশিদের দূরে সরিয়ে রাখে। অথবা তাদের শেষ করে দেয়। এই সভ্যতার প্রবণতা মাংসভোজী এবং নরখাদক, যা অন্য জাতির সম্পদ ভোগ করে বেঁচে থাকে এবং তাদের পুরো ভবিষ্যৎকে গিলে ফেলে। এই সভ্যতা সবসময় অন্য জাতিগুলোর খ্যাতি লাভে ভয় পায় এবং একে নিজের পক্ষে বিপদ বলে মনে করে, নিজের সীমান্তের বাইরে বেড়ে-ওঠা শক্তিকে বাধা দেয়, দুর্বল জাতিদের জোর করে অবদমিত করে এবং চিরকাল তাদের দুর্বল করে রাখে। তার

ক্ষমতায় আসার আগে যে মহাদেশগুলো বড় হয়ে উঠেছিল এই রাষ্ট্রিক সভ্যতা তাদের গিলে খাওয়ার জন্য নিজের ক্ষুধার্ত মুখ- ব্যাদান আরো প্রসারিত করে। আমরা অনেক যুদ্ধ, লুণ্ঠন, রাজবংশের পরিবর্তন এবং তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দশার কথা জানি, কিন্তু আগে কখনো এই ধরনের ভয়াবহ এবং নৈরাশ্যপূর্ণ সর্বগ্রাসী অবস্থা দেখিনি, এরকম একের পর এক জাতিকে আত্মসাৎ করার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়নি, পৃথিবীর বৃহদংশে এইভাবে বড় আকারে কসাইখানায় মাংস-কাটার দৃশ্য দেখিনি, এইভাবে একে অন্যের প্রাণশক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভয়ঙ্কর ঈর্ষাকে তার কুৎসিত দাঁত-নখ বড় করে ব্যবহার করতে দেখিনি। এই রাষ্ট্রিক সভ্যতা বৈজ্ঞানিক, কিন্তু মানবিক নয়। এই সভ্যতা শক্তিধর, কারণ সে তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে, ঠিক যেভাবে কোনো লাখপতি তার আত্মা বিসর্জন দিয়ে অর্থ আহরণ করে। এই সভ্যতা নিজের আস্থা নষ্ট করে, নির্লজ্জভাবে মিথ্যার বেসাতি করে, নিজস্ব মন্দিরে লোভের বিশাল দেবতাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং পূজার জন্য ব্যয়বহুল উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে গর্ব অনুভব করে, এরই নাম দেয় দেশপ্রেম। নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, এই ধরনের কাজকর্ম চলতে পারে না, কারণ জগতের একটি নৈতিক আইন আছে যা ব্যক্তির ও সংগঠিত জনগোষ্ঠীর ওপর সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা কেউই স্বজাতির নামে এই নৈতিক আইন ভঙ্গ করে ব্যাক্তি হিসেবে সুবিধা লাভ করতে পারি না। নৈতিক আদশে স্পষ্ট চিড় ধরলে ধীরে ধীরে সমাজের প্রতিটি মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা অদৃশ্যভাবে জাতির দুর্বলতা সৃষ্টি করে মানুষের প্রকৃতিতে যেসব পবিত্র বিষয় আছে সেগুলোর প্রতি মূল্যবোধবিরোধী অনাস্থা গড়ে তোলে, যা প্রকৃত অর্থে জরাগ্রস্ত অবস্থার লক্ষণ। একথা মনে রাখতে হবে যে, এই রাষ্ট্রিক সভ্যতা, এই স্বজাতিকেন্দ্রিক দেশপ্রেম কখনই দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। প্রাচীন গ্রিসে যে দীপ প্রথম প্রজ্বলিত করা হয়েছিল সেখানে তা নিভে গেছে, রোমের শক্তি শেষ হয়ে গেছে এবং তার বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের নিচে কবরস্থ হয়ে আছে। কিন্তু যে সভ্যতার ভিত্তি সমাজের মধ্যে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক আদর্শে নিহিত, তা আজও চীনদেশে এবং ভারতবর্ষে জীবন্ত হয়ে আছে। বর্তমান যুগের যান্ত্রিক ক্ষমতার মাপকাঠিতে তাকে দুর্বল ও ক্ষুদ্র দেখায় কিন্তু বীজের মধ্যই যেমন জীবন থাকে এবং তা অঙ্কুরিত হয়ে বড় হয়ে ওঠে ও শাখাপল্লব বিস্তার করে এবং সময় এলে ফুল ও ফল দেয়,

তখন তার ওপর স্বর্গ থেকে প্রসন্নতার বৃষ্টিধারা নেমে আসে। কিন্তু ক্ষমতার গগনচুম্বী অট্টালিকা ও মানুষের লোভস্বরূপ যন্ত্র ধ্বংস হলে ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি তাদের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে না; কারণ এগুলোর জীবন ছিল না, এগুলো সামগ্রিকভাবে জীবনের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল—এগুলো ছিল বিদ্রোহের ধ্বংসাবশেষ যা চিরকালের মতো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছিল।

কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, প্রাচ্যে আমরা যে আদর্শগুলো সযত্নে লালন করি সেগুলো স্থবির; তাদের নিজেদের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার কোনো উদ্দাম প্রাণোচ্ছলতা নেই। জ্ঞানের নতুন নতুন পথ খুলে দেওয়ার শক্তি নেই। প্রাচ্যের কালজীর্ণ সভ্যতাগুলোকে ধরে রাখে যে দর্শন তা সকল বাহ্যিক প্রমাণকে ঘৃণা করে এবং নিজের আত্মগত নিশ্চয়তা নিয়ে দৃঢ়ভাবে সন্তুষ্ট থাকে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট হওয়ার কারণে জ্ঞানের উদ্দেশ্যকেই অস্পষ্ট বলে ভাবতে চাই। পশ্চিমি পর্যবেক্ষকের কাছে আমাদের সভ্যতা শুধু অতীন্দ্রিয় বস্তু বলে প্রতীয়মান হয়, ঠিক যেমন একজন বধির মানুষের কাছে পিয়ানোর সুর শুধু পিয়ানো-বাদকের অঙ্গুলি চালনা বলে প্রতীয়মান হয়, তা কোনো সঙ্গীত বলে মনে হয়। তিনি চিন্তা করতে পারেন না যে, আমরা বাস্তবের সুগভীর ভিত্তিকে খুঁজে পেয়েছি যার ওপর আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছি।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বাস্তবের সব প্রমাণ আমাদের উপলব্ধিসঞ্জাত। আপনার কাছে বাস্তবতা নির্ভর করে একমাত্র আপনি কী দেখছেন তার ওপর। একজন অবিশ্বাসীর কাছে এটা প্রমাণ করা শক্ত যে, আমাদের সভ্যতা বিমূর্ত চিন্তাভাবনার কোনো অস্পষ্ট ব্যবস্থা নয়; এই সভ্যতা এমন কিছু সৃষ্টি করেছে যা ইতিবাচক সত্য, যে সত্য মানুষের অন্তরকে তার আশ্রয় ও পুষ্টি দিতে পারে। এই সভ্যতা এক ধরনের অন্তর্জগতের অনুভূতি ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে, এক দিশার অনুভূতি যা সকল সসীম বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে অসীমের দিশা।

কিন্তু তিনি বলবেন, 'তোমরা তো প্রগতির পথে এগোওনি, তোমাদের মধ্যে গতি নেই।' আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 'আপনারা কী করে বুঝলেন? প্রগতির লক্ষ্য বিচার করেই প্রগতিকে বুঝতে হয়। রেলগাড়ি তার গন্তব্য স্টেশনের দিকেই এগিয়ে যায় এর নামই গতি। কিন্তু একটি পূর্ণ-বিকশিত বৃক্ষের এই ধরনের কোনো নির্দিষ্ট গতি থাকে না; এর প্রগতি বলতে বোঝায় তার জীবনের অন্তর্মুখী প্রগতি। বৃক্ষ তার পাতায় পাতায়

আলোর দিকে যাওয়ার আশা নিয়েই বাঁচে এবং তার নিঃশব্দ জীবনীশক্তির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।'

আমরাও অনেক শতক ধরে বেঁচে আছি; এবং এক বাস্তব অস্তিত্ব গড়ে তোলার আশা নিয়ে চলেছি, যে বাস্তব অস্তিত্ব মৃত্যুকে পেরিয়ে যায়, জীবনে সকল অশুভের ওপরে উঠে মৃত্যুর অর্থ খুঁজে পায়, স্বার্থকে সানন্দে অস্বীকার করে শান্তি ও বিশুদ্ধতা নিয়ে আসে। এই আত্মিক জীবনের ফসল হলো এক জীবন্ত ফল। যখন যুবক ক্লান্ত ও ধূলিধূসরিত হয়ে ঘরে ফেরে, যখন সৈনিক আহত হয়, যখন ধন-সম্পদ নষ্ট করে ফেলা হয় এবং গর্ব ধূলিসাৎ হয়, যখন তথ্যের প্রাচুর্যের সত্যকে খুঁজে নেওয়ার জন্য এবং একাধিক বিরোধী প্রবণতার মধ্যে সংগতি খুঁজে পাওয়ার জন্য মানুষের মন ব্যাকুল হয়, তখন তার এই ফলের প্রয়োজন। জাগতিক বস্তুর প্রাচুর্য নয়, বরং তার আধ্যাত্মিক পূর্ণতাতেই তার মূল্য।

জীবনে অনেক কিছু থাকে যা অপেক্ষা করতে পারে না। যদি আপনাদের সংগ্রাম করতে হয় অথবা বাজারে শ্রেষ্ঠ স্থানটি পেতে হয় তাহলে আপনাদের দ্রুতগতিতে দৌড়াতে হবে। আপনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ পড়বে। পথের ধারে পড়ে থাকা সুযোগের পেছনে দৌড়ানোর সময় সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু এমন অনেক আদর্শ আছে যা আমাদের জীবনে লুকোচুরি খেলে না; সেগুলো ধীরগতিতে বীজ থেকে ফুলে এবং ফুল থেকে ফলে বিকশিত হয়। অসীম পরিসর এবং স্বর্গীয় দ্যুতি তাদের প্রয়োজন হয়। সেগুলো যে ফল দেয় তা বহু বছরের অপমান ও অবহেলা সহ্য করেই বেঁচে থাকে। প্রাচ্য তার আদর্শগুলো নিয়ে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে। নিজের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে সূর্যালোক ও নক্ষত্রদের নিঃস্তব্ধতা নিয়ে সেগুলো লালন করে যতক্ষণ না পাশ্চাত্য সুযোগের পেছনে ত্রস্তভাবে দৌড়ে দম হারিয়ে থেমে যায়। ইউরোপ তার উদ্দীষ্ট লাভের জন্য ব্যস্তভাবে ধাবিত হয় এবং তার শকটের জানালা দিয়ে খেতে শস্যকাটায় রত কৃষকের প্রতি অবজ্ঞা ভরে দৃষ্টিপাত করে এবং নিজের গতির মাদকতায় কৃষককে ধীরে ধীরে পেছন দিকে চলে যেতে দেখে। কিন্তু একসময় গতি থেমে যায়; উদ্দীষ্ট বস্তু তার অর্থ হারিয়ে ফেলে এবং ক্ষুধার্ত হৃদয় খাদ্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে; শেষপর্যন্ত তাকে রোদের মধ্যে শস্যকর্তনরত সহজ সরল কৃষকের কাছে আসতে হয়। কারণ, যদি দম্ভর অপেক্ষা করতে না পারে, অথবা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা উত্তেজনার জন্য প্রবল অভীপ্সা অপেক্ষা করতে না পারে তাহলে যথার্থ প্রেম

অপেক্ষা করে। সৌন্দর্য, দুঃখ-কষ্টের বোধশক্তি ও ধৈর্যসহকারে নিবেদিত প্রাণ এবং সহজ সত্যের জন্য সশ্রদ্ধ সহিষ্ণুতা অপেক্ষা করে। এভাবে প্রাচ্য তার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে।

আমি দ্বিধাহীনভাবে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি, কারণ অনেক বিষয়ে ইউরোপ যে শ্রেষ্ঠ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের অন্তর থেকে আমরা তাকে পছন্দ না করে পারি না এবং তার প্রতি আমাদের প্রশংসা ও আন্তরিক সম্মান জানাই। ইউরোপ তার সাহিত্য ও চারুকলার মাধ্যমে সে সৌন্দর্য ও সত্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার সকল দেশের কাছে এবং সর্বকালের জন্য খুলে দিয়েছে। ইউরোপের অক্লান্ত মানসিক শক্তি টাইটান[১]-এর মতো বিশাল, যা বিশ্বের উচ্চতা ও গভীরতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র সবার কাছ থেকেই তার জ্ঞানের জন্য সম্মান লাভ করেছে। সে তার অতুল বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও হৃদয়ানুভূতি দিয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করে, যা এখনও পর্যন্ত আমরা আশাহীন আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে সহ্য করে যাচ্ছি। ইউরোপ ধরণীকে অধিক শস্য উৎপাদনে বাধ্য করছে, যা আগে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, এবং মানুষের সেবায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ব্যবহৃত হতে বাধ্য করেছে। এই ধরনের প্রকৃত কীর্তির পেছনে নিশ্চয়ই তার আধ্যাত্মিকতার গতি উৎপাদক শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। কারণ, একমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিই সকল সীমাবদ্ধতাকে জয় করতে পারে, তার চরম সাফল্যে বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে, প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমানকে অতিক্রম করে তা সন্ধানী আলো ফেলতে পারে, জীবনে যে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয় না তার জন্য শহীদের দুঃখ-যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করতে পারে, এবং পরাজয় স্বীকার না করে ব্যর্থতাকে গ্রহণ করতে পারে। ইউরোপের হৃদয়ে রয়েছে বিশুদ্ধতম মানবিক প্রেম, ন্যায় প্রীতি, উচ্চতর আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গী মানসিকতা, আর তার জীবনের গভীর কেন্দ্রে সুপ্ত রয়েছে কয়েক শতাব্দীর খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি। ইউরোপে আমরা মহান হৃদয়বান মানুষদের দেখেছি যারা সব সময় মানুষের অধিকারের জন্য বর্ণ ও ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে; যারা সাহসের সঙ্গে নিজেদের লোকদের কাছ থেকে নিন্দা ও অপমান সহ্য করেও মানবিকতার আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং যখন বিকৃতমস্তিষ্ক যুদ্ধবাদের তাণ্ডব পাশবিক প্রতিহিংসা বা গৃধ্নুতা সমগ্র জনগণকে গ্রাস করেছে তখন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন,

১। গ্রিক পুরাণে বর্ণিত স্বর্গ ও ধরিত্রীর অতিকায় অমিত শক্তিমান পুত্র।

যারা অতীতে নিজ জাতির অন্যায় কৃতকর্মের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে সবসময় প্রস্তুত থেকেছেন, এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিরোধে দুর্বল এবং নিরীহ হওয়ার কারণে ভীরুতাজনিত অবিচারের অপ্রতিহত স্রোত রোধ করতে চেষ্টা করেছেন, তারা আধুনিক ইউরোপের 'নাইট'[২]–সুলভ বীরোচিত কাজে উৎসাহী হয়ে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি এবং ভৌগোলিক সীমা বা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা সীমিত হয় এমন আদর্শগুলোর প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেননি। এখন মানুষদের অস্তিত্বই প্রমাণ করে ইউরোপের জীবনের ফল্গুধারা শুকিয়ে যায়নি, এবং সেখান থেকেই বার-বার তার পুনর্জন্ম ঘটবে। একমাত্র সেই জায়গা থেকে ইউরোপ খুব সচেতন ভাবেই তার গভীরতর স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে তার নিজের ক্ষমতা গড়ে তুলতে চাইছে এবং তাকে ব্যঙ্গ করছে, তার অবিচার গগনস্পর্শী হয়ে উঠছে, যা ঈশ্বরের প্রতিবিধানের জন্য ব্যাকুলভাবে রোদন করছে। পৃথিবীর ওপর তার হৃদয়হীন বাণিজ্যের মাধ্যমে সুন্দর ও মঙ্গলের বিরুদ্ধে মানুষের বোধকে ধ্বংস করে শারীরিক ও মানসিক কদর্যতার সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। যখন সে সমগ্র মানবজাতির কথা বিবেচনা করে তখন ইউরোপের বদান্যতা দেখা যায়; কিন্তু যখন সে শুধু তার নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তখন তার অনিষ্টকর দিকটি চরম অশুভ শক্তি হিসেবে দেখা দেয় এবং মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত অসীম ও চিরকালীন গুণগুলোর বিরুদ্ধে যায়।

পূর্ব এশিয়া তার সভ্যতা থেকে বিবর্তিত নিজস্ব পথ অনুসরণ করছে, যা রাজনীতি সর্বস্ব ছিল না, তা ছিল সামাজিক, যা লুণ্ঠন-মনোবৃত্তি সম্পন্ন ও যান্ত্রিকভাবে দক্ষ ছিল না, বরং তা ছিল আধ্যাত্মিক এবং মনুষ্যত্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গভীরতর সম্পর্কের ওপর অধিষ্ঠিত। নির্লিপ্ততার সুরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের কথা চিন্তা করা হয়েছিল, যেখানে রাজবংশী পরিবর্তন ও বৈদেশিক আক্রমণ কদাচিৎ তাদের স্পর্শ করতে পারত। কিন্তু এখন আমরা বহির্বিশ্বের নাগালের মধ্যে এসে গেছি, আমাদের একান্ততা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু এজন্য আমরা দুঃখ বোধ করি না, চারাগাছ যেমন তার বীজ ভেঙে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটি বুঝতে না পারলেও সে কখনই দুঃখিত হয় না। এখন সময় এসেছে যখন আমাদের পৃথিবীর সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে অবশ্যই

২. Knight (নাইট) - ইউরোপে মধ্যযুগে সম্মানজনক সামরিকপদ উন্নীত অভিজাত বংশের বীর সন্তানকে 'নাইট' বলা হতো হতো।

ভাবতে হবে, পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মানব সভ্যতার সঙ্গতি রেখে চলতে হবে; আজ আমরা বোকার মতো গর্ব করতে পারি না যে, আমরা আমাদের খোলকের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবীর যে কঠিন আবরণ আমাদের রক্ষা করছে এবং পুষ্টি জোগাচ্ছে তার মধ্যে নিজেদের আঁটোসাঁটো করে আবদ্ধ করে রাখব। খোলক এবং শক্ত আবরণ ভেঙে ফেলতেই হয় যাতে মানুষের জীবন তার সকল প্রাণশক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে জগতের মুক্ত আলোকে তার প্রদেয় অর্ঘ্য নিয়ে জন্ম নিতে পারে।

বাধাবিপত্তি দূর করে জগতের মুখোমুখি হওয়ার এই কাজে প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে জাপান প্রথম এগিয়ে এসেছে। সমগ্র এশিয়ার অন্তরে সে আশা জাগিয়ে তুলেছে। এই আশা সব সৃষ্টিশীল কাজে প্রয়োজনীয় সুপ্ত আগুন জুগিয়ে দেয়। এশিয়া এখন বুঝতে পেরেছে যে, জীবনমুখি কাজ দেখিয়ে তাকে বেঁচে থাকার প্রমাণ দিতে হবে। তার নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে থাকলে চলবে না অথবা মোহগ্রস্ত হয়ে বা খোসামুদি করে পাশ্চাত্যের অক্ষম অনুকরণ করা চলবে না। এই কারণে সূর্যোদয়ের এই দেশটিকে[৩] আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই তাকে প্রাচ্যের নির্ধারিত ব্রত সফল করার জন্য তার দায়িত্ব সম্বন্ধে মনে করিয়ে দিই। তাকে আধুনিক সভ্যতার অন্তরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে হবে। সে যেন কখনই বিষাক্ত লতাগুল্মের জঙ্গলের দ্বারা এই প্রাণশক্তিকে দমবন্ধ হয়ে নষ্ট হতে না দেয়, বরং তাকে আলো ও মুক্তির দিকে, বিশুদ্ধ বাতাস ও প্রশস্ত পরিসরের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে সে তার দিনের আলোয় ও রাতের অন্ধকারে স্বর্গীয় উৎসাহ পাবে। তার আদর্শগুলোর মহত্ত্ব সকল মানুষের সামনে প্রতিভাত হোক, যেভাবে তুষারাবৃত ফুজি পর্বতমালা[৪] অসীমের রাজ্যে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিশেষভাবে আলাদা থেকেও দেশের অন্তর থেকে উঠে আসে, ঠিক যেমনভাবে সুন্দরী তরুণী তার অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিমার তরঙ্গ নিয়ে দৃঢ় ও শক্তিমতী এবং গভীরভাবে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে ওঠে।

---

৩. উদীয়মান সূর্যের দেশ (Land of Rising Sun)– জাপানি ভাষায় জাপান দেশটির নাম 'নিপ্পন' বা 'নিহন'। দেশটি প্রশান্ত মহাসাগরে একটি দ্বীপরাষ্ট্র যা এশিয়া মহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত হওয়ার কারণে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো এখানে এসে পড়ে। সেজন্য তাকে উদীয়মান সূর্যের দেশ বলা হয়।

৪. ফুজি পর্বতমালা– জাপানের উচ্চতম পর্বত যা জপানিদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত।